Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 73
Website: https://tirj.org.in, Page No. 652 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 652 - 661
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলার প্রতিবাদী লোকোধর্ম : প্রসঙ্গ বলাহাড়ি সম্প্রদায়

ড. প্রদীপ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
কৃষ্ণনাথ কলেজ
Email ID : pmhis@msduniv.ac.in

Received Date 20. 12. 2024
Selection Date 01. 02. 2025

Keyword
Balahari, protests, opposing, culture, Bankura, Purulia, Murshidabad, Balaram.

Abstract
The middle of the 18th century saw several folk religions to have heaved in sight to a larger extent in different parts of Bengal, and many of them amongst themselves displayed strong flavour of protests or disagreements that arose primarily depending on religious principles in multiple ways. Nihar Ranjan Ray, in his report presented to the National Congress Session in 1975, called attention to, with enough and perceivable pellucidity, these protestant characters he observed in the folk religions of that time. An ideal example of such a folk religion, that distinctively marked it out to be a protestant one, is Balahari, or Balarami, or Balaram Bhaja religious community. This religious sect was given its congregated formation by the Hari community in the region of Meherpur, located in the district of undivided Nadia, under the leadership of Balaram Hari. Later on, present day Nischintapur of Nadia district turned out to be one of the biggest centers of this religious sect. Bankura, Purulia, and Murshidabad as well gradually came under a massive influence of this religious community and their evidently distinctive religious perspectives. Around 1780, Balaram Hari took his holy birth, and he took his last breath around 1850. The Hari community and their distinctive religious perspectives established their erect heads, that patently displayed its religious sway in different geographical locations, fundamentally through opposing Vaishnavism and specifically Brahmin religious culture. That is why, in their religious culture one can easily trace their force of oppositions in several ways, specifically with respect to religious rituals, principles and practices of worship. The Hari community does not allow and accept the use of Dip, Dhup, Dhuna, Tulsi and Tilak and even Gangaajal while maintaining any religious creed and custom. And this essentially unique and rudimentarily unmixed religious perspective provides the Hari community with a separate recognition.

Discussion

অষ্টাদশ শতকে ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং উচ্চ বর্ণের আধিপত্যের বিরুদ্ধে নদিয়া জেলায় যে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে তার ফলশ্রুতিতেই জন্ম নিয়েছিল একধিক গৌণধর্মের। এই সময়ে নবদ্বীপ সন্নিহিত এলাকা সহ অবিভক্ত নদিয়া জেলার মহকুমা মেহেরপুরে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 73
Website: https://tirj.org.in, Page No. 652 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মানবতাবাদের চর্চা শুরু হয়। সমাজের উপরিতলার মানুষ তথা সমাজপতিদের শোষণের মাত্রা ছাড়িয়েছিল। নিচু তলার হাড়ি, ধোপা, মালো, ডোম, বাগদি, কৈবর্ত, বেদে, বুনো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল অস্পৃশ্য। তাদের সাধারণ ধর্মাচরণের অধিকার পর্যন্ত ছিল না। এই পরিস্থিতিতে মেহেরপুরে আবির্ভূত হন বলরাম হাড়ি নামে এক অন্ত্যজ শ্রেণির ধর্মীয় নেতা। বলরাম প্রতিষ্ঠিত এই সম্প্রদায় বলরামী, বলরামভজা, বলাহাড়ি মত, বলরামচন্দ্রের ধর্ম, হাড়িরাম, সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

অক্ষয়কুমার দত্ত বলরামী সম্প্রদায়কে 'চৈতন্য সম্প্রদায়-এর শাখা'[১], বিশ্বকোষ গ্রন্থের দ্বাদশ ভাগে 'তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের শাখা'[২] বলে অভিহিত করা হলেও তাদের ধারণা ঠিক নয়। কারণ বলরাম ছিলেন ঘোরতর ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিরোধী। তাঁর এই বিরোধিতার সুর পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে –

> "একদিন বালরাম নদীতে স্নান করিতে গিয়া দেখিল, কয়েকজন ব্রাহ্মণ তথায় পিতৃলোকের তর্পণ করিতেছেন। সেও তাহাদের ন্যায় অঙ্গ-ভঙ্গি করিয়া নদী কূলে জল সেচন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া একটি ব্রাহ্মণ তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলাই, তুই ও কি করিতেছিস? সে উত্তর করিল, আমি শাকের খেতে জল দিতেছি। ব্রাহ্মণ কহিলেন, এখেনে শাকের ক্ষেত কোথায়? বলরাম উত্তর দিল, আপনারা যে পিতৃলোকের তর্পণ করিতেছেন, তাঁহারা কোথায়? যদি নদীর জল নদীতে নিক্ষেপ করিলে, পিতৃলোকেরা প্রাপ্ত হন, তবে নদীর কূলে জলসেচন করিলে শাকের ক্ষেতে জল না পাইবে কেন?"[৩]

বলরাম এবং হাড়িদের সম্পর্কে জানার উপাদানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এর একটি বড় কারণ হল, বলরাম এবং তার অনুগামীদের সকলেই ছিলেন অস্পৃশ্য সম্প্রদাভুক্ত। তাই সমাজের শিক্ষিত উচ্চবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। এ সম্পর্কে সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন, -

> "অন্ত্যজ বর্গের মধ্যে প্রচারিত এই সম্প্রদায় সম্পর্কে ছাপার অক্ষরে প্রথম উল্লেখ দেখা যায় ১৮৬২ সালে, কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ'-এর ২৬-শে ফাল্গুন ১২৬৯ সংখ্যায়।"[৪]

১৮৭০ সালে অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' থেকে বলরামিদের সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। মেহেরপুর নিবাসী লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায় 'সেকালের স্মৃতি' তে বলরাম সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন তা একটি নির্ভরযোগ্য উপাদান। ১৮৭২ সালে যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মেহেরপুরে যান এবং বলরামের স্ত্রীর সাথে দেখা করেন। তিনি লিখিছেন,-

"I met her in the year 1872."[৫]

তিনি এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন হিন্দু কাস্ট অ্যান্ড সেক্ট নামক গ্রন্থে। তবে এই বিবরণগুলি থেকে বলরাম এবং হাড়িদের সম্পর্কে খুব সামান্যই তথ্য পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী ১৯৭১ সালে মেহেরপুরে যান এবং হাড়িদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন।

সাময়িক পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ'-এর ২৬ শে ফাল্গুন, ১২৬৯ বঙ্গাব্দের সংখ্যার (১৮৬২) প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, 'প্রায় ৫/৬ বৎসর হইল, বলরাম হাড়ি মানবলীলা সম্বরণ করিয়েছে।'[৬] অক্ষয়কুমার দত্ত লিখেছেন, "১২৫৭ সালের ৩০ এ অগ্রহায়ণে অনুমান ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রমে তাহার মৃত্যু হয়।"[৭] আবার দীনেন্দ্রকুমার লিখেছেন, 'বাঙলা ১১৯০ বা ১১৯১ সালে বলরাম জন্মগ্রহণ করেন।'[৮] এই সকল তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ১৭৮০ সালের আশেপাশে বলরাম জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫০ সালের আশেপাশে তাঁর মৃত্যু হয়।

বলরাম মেহেরপুরের মালোপাড়ার অস্পৃশ্য হাড়ি বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁর পিতার নাম গোবিন্দ হাড়ি এবং মাতার নাম গৌরমণি। হাড়ির ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে শৈশবেই তাঁর মনে ধর্মভাব অঙ্কুরিত হয়েছিল। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি যৌবনকালে মল্লিক জমিদারদের গৃহ-বিগ্রহ আনন্দ বিহারীর দেবয়াতনের রক্ষী নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই চাকরি পেয়ে বলরাম আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি বিগ্রহের বাসগৃহে প্রবেশ করতে না পারলেও দূরে থেকে ভক্তিভরে আনন্দবিহারীর পূজার্চনা করতেন। আনন্দ বিহারীর দেহের স্বর্ণালঙ্কার, রত্ন-মুকুট ও পায়ের সোনার নূপুর ছিল; বলরামের প্রতি এই সব অলঙ্কার রক্ষার ভার অর্পিত হয়েছিল।

ভাগ্যের এমনই পরিহাস, বিশে ডাকাতের সম্ভাব্য আক্রমণের হাত থেকে প্রভুকে রক্ষা করেও পরে সেই প্রভুর লাঞ্ছনা ও পীড়ন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না বলরাম হাড়ি। ‘হঠাৎ এক রাতে মল্লিকদের গৃহদেবতার সমস্ত অলঙ্কার গেল চুরি হয়। সন্দেহ পড়ল বলরামের ওপর। তাকে গাছে বেঁধে চলল প্রচণ্ড প্রহার। শেষ পর্যন্ত সকলের পরামর্শে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়া হলো তাকে। এই ঘটনায় বৈরাগ্য এসে গেল বলরামের মনে। ছিঃ এত নীচু মানুষের মন? নীচু জাতি বলে বড়লোকদের এত ঘেন্না? সহসা তার মধ্যে জন্ম নিল এক প্রতিবাদী মানুষ। এই অসহায় জীবন, সমাজের এই অন্যায়, বিশ্বাসের এই স্খলন তাকে তলিয়ে দিল। বলরাম হাড়ি অপমানে লাঞ্ছনায় ম্রিয়মাণ হয়ে মেহেরপুর ত্যাগ করেন, চলে যান লোকচক্ষুর অন্তরালে। কোথায় যান - কেউ জানে না। বেশ কয়েক বছর পর তিনি অনেক শিষ্য-সাগরেদ সঙ্গে নিয়ে আবার মেহেরপুরে ফিরে আসেন। কিন্তু তখন তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা আমূল বদলে যাওয়া অন্য মানুষ। কেশে-বেশে, চেহারায়-পোশাকে কত না পরিবর্তন। শিষ্য-ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে ভৈরব তীরে আশ্রয় গড়ে নিয়ে নবলব্ধ ধর্মমতের চর্চা করতে থাকেন।

ততদিনে মল্লিক বাড়ির অলঙ্কার চুরির কিনারা হয়েছে। প্রকৃত চোর ধরা পড়েছে। ফলে অনুতপ্ত জমিদার পদ্মলোচন মল্লিক বলরাম হাড়ির সাধন ভজনের জন্য ভৈরবতীরে জমি দেন। আশ্রম তৈরিতে আর্থিক সহযোগিতা পর্যন্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে একদিন তাঁরই কারণে মেহেরপুর থেকে বলরামের উৎখাত হয়, আবার সাধক রূপে প্রত্যাগমনের পর এই মেহেরপুরে তাঁর প্রতিষ্ঠার নেপথ্যেও তিনি ভূমিকা পালন করেন। অথচ এই বলরামের প্রতিষ্ঠা উচ্চশ্রেণির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই। দীর্ঘকালের ব্রাহ্মণ্য শাসন ও শোষণে পর্যদুস্ত কৈবর্ত, বেদে, বাগদি, নমঃশূদ্ররা দলে দলে এসে বলরামকে পরিত্রাতা হিসেবে গ্রহণ করে। হাড়ি, ডোম, মুচি, বাগদির পাশাপাশি নিম্নবিত্তের মুসলমানরা পর্যন্ত তার শিষ্যত্ব বরণ করে।[৯] এই কাহিনী কতটা সত্যি তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় কারণ এই বিষয়ে সমকালীন কোন উপাদান পাওয়া যায় না। তবে একাথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে মল্লিক বাড়ির চুরি যাওয়ার ঘটনা বলরামের জীবনের মোর ঘুরিয়ে দেয়। মৃত্যুর পর তাকে সমাহিত করা হয় তার মালোপাড়ার আশ্রমে। বলরামে মৃত্যুর পর হাড়ি সম্প্রদায়ের দায়িত্ব নেন তাঁর স্ত্রী ব্রহ্ম মালোনী। বলরামে মৃত্যুর পর হাড়ি সম্প্রদায়ের দায়িত্ব নেন তাঁর স্ত্রী ব্রহ্ম মালোনী। এই ব্রহ্ম মালোনী কে ছিলেন - বলরামের বৈধ পত্নী, সাধন সঙ্গিনী, না সেবিকা, নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে যোগেন্দ্রনাথের বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ব্রহ্ম মালোনী ছিলেন বলরামের স্ত্রী। তিনি বলরামের মৃত্যুর পর মালোপাড়ায় যান এবং ব্রহ্ম মালোনী-এর সাথে কথা বলেন।[১০]

বলরামের মহিমা ধীরে ধীরে প্রচারিত হতে থাকে এবং হাড়ি সম্প্রদায়ের সদস্য বাড়তে থাকে। মেহেরপুরের গণ্ডি পেড়িয়ে বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, রাজশাহী, কুষ্ঠিয়া চুয়াডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে বলরামের মতাদর্শ ছড়িয়ে পরে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এই সম্প্রদায়ের ভক্ত সংখ্যা ছিল কুড়ি হাজার। উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন, -

> “After wandering about for some years, he set himself up as a religious teacher, and attracted round him more than twenty thousand disciples.”[১১]

পশ্চিমবঙ্গে বলরামিদের প্রধান তিনটি সাধন ক্ষেত্র রয়েছে। প্রথমটি নদিয়া জেলার তেহট্ট ব্লকের নিশ্চিন্তপুর, দ্বিতীয়টি পুরুলিয়ার আদ্রার নিকটবর্তী দৈকিয়ারী গ্রাম এবং তৃতীয়টি বাঁকুড়ার ঝাটিপাহাড়ীর কাছে শালুনি গ্রাম।

তবে ১৯৪৭ সালের পর এদের সংখ্যা কমতে থাকে। ‘বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা মেহেরপুর’ থেকে জানা যায়-

> “বৃন্দাবন হালদার (বলরামিদের অন্যতম নেতা)-এর মৃত্যুর পর (১৯৮৫) বাংলাদেশে বলরামীদের পাওয়া যায় না। কুষ্ঠিয়ার বারোখাদায় সত্তর ঘর বলরামি আছে, যারা বংশপরম্পরায় এই লোকধর্মটিকে ধরে রেখেছে। চুয়াডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জের রামসেবক বিশ্বাস, কুষ্টিয়ার জুগিয়ার রঞ্জিতকুমার দাস, বারোখোদার অনন্ত দাস, বলাই দাস হলেন কয়েকজন হাড়িদের অন্যতম সদস্য।”[১২]

হাড়ি সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় প্রধান কেন্দ্র হল বর্তমান নদিয়া জেলার নিশ্চিন্তপুর। মেহেরপুর থেকে কিভাবে নিশ্চিন্তপুরে এই কেন্দ্রটি গড়ে উঠল তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তীর লেখায়। তিনি লিখেছেন -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 73
Website: https://tirj.org.in, Page No. 652 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "আসলে আগেকার দিনে নদীয়া যখন ভাগ হয়নি তাখন মেহেরপুর ছিল একটা মাহকুমা শহর। আশেপাশের গ্রামগঞ্জ থেকে কেনা বেচা বা মামলা মকদ্দমার কাজে মেহেরপুরে আসত মানুষ। এই রকম কোন কাজে নিশ্চিন্তপুরের তনু মণ্ডল সেখানে এসেছিলেন একবার। নেহাতই দৈব ঘটনায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় বলরামের। বলরামের বাকপটুতা, ঐশীক্ষমতা আর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে তনু তাঁর শিষ্যত্ব নেয়। এই তনু থেকেই নিশ্চিন্তপুরে বলরাম-ভজনার শুরু। আস্তে আস্তে ওই গাঁয়ের মৎস্যজীবী নমঃশূদ্ররা বলরামভজা হয়ে ওঠে। তনুর অনুরোধে মেহেরপুর থেকে হাঁটাপথে বলরাম নিশ্চিন্তপুরে আসেন বেশ কয়েকবার। সেখানে তাঁর কাছে দীক্ষা নেন মহীন্দর, রামচন্দ্র দাস, জলধর, সদানন্দ, শ্রীমন্ত, আর রাজু ফকির। মেয়েদের মধ্যে দীক্ষা নেয় নটু, দক্ষ আর জগো। দেখতে দেখতে ধরমপুর, সাহেবনগর, আরশীগঞ্জ, নাটনা, ধা'পাড়া, হাউলিয়া, গরিবপুর, পলাশীপাড়ায় ছড়িয়ে পরে বলা হাড়ি মত।"[১৩]

বলরামের মৃত্যুর পর মেহেরপুরে সংগঠন পরিচালনার নেতৃত্ব দেন ব্রহ্ম মালী আর নিশ্চিন্তপুরের তনু মণ্ডল। নিশ্চিন্তপুরের ভক্তদের কাছে বলরম হাড়িরাম নামে পরিচিত। তনু মণ্ডল এর নেতৃত্বেই নিশ্চিন্তপুরে বলরামিদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। তাঁর নেতৃত্বেই বেলতলায় প্রতিষ্ঠিত হয় হাড়িরামের আশ্রম। একটি গানে তনুর মাহাত্মকে এইভাবে তুলে ধরা হয়েছে -

"ত্রেতাযুগে ছিল হনু
মেহেরাজে নাম তনু।।
পেয়ে রামের পদরেণু
চারযুগে সঙ্গে ফেরে।।"[১৪]

এখানে তনুকে রামচন্দ্রের ভক্ত হনুমানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। হাড়িরাম এখানে মাঝে মধ্যেই আসতেন। আর উৎসবের সময় মেহেরপুর থেকেও প্রচুর ভক্ত এখানে আসতেন। হাড়িরাম নিশ্চিন্তপুরে যাদের প্রত্যক্ষভাবে দীক্ষা দিয়েছিলেন তাঁদের না, জাতি এবং বাসস্থানের পরিচয় এই রকম -

"দীনু। জাতে মুচি। চাঁদবিল গ্রাম।
রামচন্দ্র। নমঃশূদ্র। নিশ্চিন্তপুর
ধনঞ্জয়। জাতপরিচয় অজ্ঞাত। বীরভূম।
রাজু ফকির। মুসলমান। গোপীনাথপুর।
নীলু। যুগী। বাসস্থান অজ্ঞাত।
সদানন্দ। হাড়ি। পঞ্চকোট।
শ্রীমন্ত। মাহিষ্য। নিশ্চিন্তপুর।
দক্ষ, জগ, নুটু। নারীশিষ্যা। ভিক্ষোপজীবিনী।
বলাই গেঁড়ো। মাহিষ্য। সাহেবনগর।"[১৫]

এই নিশ্চিন্তপুরে হাড়িদের সম্পর্কে জানার উপায়ের বিশেষ অভাব রয়েছে। অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তীই প্রথম এই অঞ্চলের হাড়িদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেন। ১৯৭০ এর দশকে তিনি এই অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক অনুসন্ধান চালান এবং বলরামীদের অবস্থা জনসমক্ষে তুলে ধরেন। ১৯৭২ সালে যখন সুধীর চক্রবর্তী মহাশয় নিশ্চিন্তপুরে পৌঁছন তখন হাড়িরামী শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পূর্ণদাস হালদার এবং বিপ্র দাস। তিনি সেই সময় লক্ষ্য করেন বিপ্র দাসের প্রখর বৈষ্ণব বিরোধিতা। সাহেব নগরের বৈষ্ণব আখড়ায় একবার বিপ্র দাসকে প্রসাদ গ্রহণ করতে বলা হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করেন হাড়িরামের নিষেধ বাণী -

"না করিব অন্য দেবের নিন্দন বন্দন।
না করিব অন্য দেবের প্রসাদ ভক্ষণ।
মৎস্য মাংস না খাইব তিল না মাখিব গায়ে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 73
Website: https://tirj.org.in, Page No. 652 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নারীসঙ্গ না করিব আপন ইচ্ছায়।"[১৬]

মোহান্ত যখন জানতে চাইলেন সেবা গ্রহণ না করার কারণ, তখন বিপ্র দাস যুক্তিসম্মত ভাবে উত্তর দেন –

> "সেবা তো নেবো কিন্তু দেব কে? মোহান্ত বললেন, কেন? সেবা দাও পরম আত্মাকে। উত্তরে তিনি বলেন, মোহান্তজী এই ভোগ তো আপনারা পরমাত্মাকে উৎসর্গ করা, তা আমি সেই উচ্ছিষ্ট বস্তু কেন আমার পরমাত্মাকে সেবা দেব বলুনতো?"[১৭]

বলরাম যেমনভাবে বৈষ্ণবদের বিরোধিতা করতেন, ঠিক একই সুর পাওয়া গেল বিপ্র দাসের গলায়।

হাড়ি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল ব্রাহ্মণ্য ও বৈষ্ণব ধর্মের বিরোধিতা করে। তাই তাদের আঁচার অনুষ্ঠান, ধর্মীয় রীতিনীতি ও সাধন পদ্ধতির মধ্যে এই বিরোধিতার রূপটি স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রদায়ের শিষ্যরা বলরামকে রামচন্দ্রের অবতার বলে মনে করতেন। দোলের সময় বলরাম নিজে দোলমঞ্চে আরোহণ করে বসতেন আর শিষ্যরা আবির ও ফুল দিয়ে তাঁর পূজা করত। বলরামের জন্ম নিয়ে অবতারের কাহিনী প্রচলিত হয়েছে সম্প্রদায়ের মধ্যে। এ বিষয়ে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন- দেবত্বগুন আরোপ করা হয়ে থাকে এমন অনেক ধর্মগুরুর মত বলরাম সম্বন্ধেও সৃষ্টি হয়েছে অনেক কাহিনী, যার ফলে তাঁর জন্মবৃত্তান্তেও খানিকটা অলৌকিকতত্ত্ব আরোপিত হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর পিতার বিবাহের সময় গনৎকাররা ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন, যে এই বিবাহের ফলে যে পুত্র জন্মাবে সেই হবে বংশের শেষ সন্তান। এরপর স্ত্রী যখন অন্তঃসত্ত্বা হন তখন সে ব্যাপারটা সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখেন। একদিন বিকেলে একটি শিশু মাথা ভর্তি চুল ও দাড়ি নিয়ে খরের চাল থেকে লাফিয়ে পড়ে এবং আশ্চর্যজনকভাবে স্ত্রীলোকটি দেখেন যে তাঁর গর্ভ শূন্য হয়ে গেছে। তিনি সেই শিশুটিকে জড়িয়ে চুপিসারে জঙ্গলে পরিত্যাগ করে আসেন। কিন্তু পাশের গ্রামে ছিল তাঁর এক ভগিনী। বলরাম তাকে স্বপ্নে দেখা দেন। পরের দিন সকালে শিশুটিকে সঙ্গে নিয়ে আসে। এরপর পালিতা মাতা কাজ পায় এক জমিদাদের বাড়িতে এবং বলরাম বড় হলেও তাকেও নিয়োগ করা হয় জমিদারের গরু চরানোর কাজে। জন্মটি অলৌকিক এবং কাহিনীটির মিল রয়েছে রাখাল বালক কৃষ্ণের সঙ্গে।[১৮]

হাড়িরামের তত্ত্ব অনুযায়ী এই পৃথিবী তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর শরীর 'ক্ষয়' করে। তিনি মানব দেহের হাড়ের সৃষ্টি করেছেন তাই তাঁর নাম হাড়ি। হাড়ি সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা পূর্ণ হালদার ব্যাখ্যা দিয়েছেন হারিরামের কল্পিত যুগতত্ত্ব, -

> "আদি যুগে কিছুই ছিল না। অনাদি যুগে সৃষ্টি হয় গাছ পালা। দিব্যযুগে কোনো নারী ছিল না। তখন হাড়িরাম তাঁর হাই থেকে করলেন হৈমবতী সৃষ্টি। হৈমবতী আদ্যাশক্তি। তাঁর থেকে হলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। তাই হাড়িরামের নিগূঢ় তত্ত্ব যারা তাড়া বুঝেন কী করে? সত্য ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এই চারযুগ তো অনেক পরে- যে চার যুগে চার অবতার। হাড়িরাম তারও একযুগ আগের দিব্যযুগের মানুষ। তাঁর হৈমবতী, হৈমবতীর সৃষ্টি বিষ্ণু। কাজেই বিষ্ণু এবং তাঁর অবতার রামচন্দ্র আসলে হাড়িরামেরই অবতার।"[১৯]

এর উল্লেখ পাওয়া যায় হাড়িরামি তত্ত্বের গানে -

"দিব্যযুগে যিনি হাড়ি
সত্যযুগে বলিহারি
ত্রেতাযুগে দর্পহারি
দ্বাপর যুগে ভৃগুরাম
কলিযুগে সেই হাড়িরাম
প্রকাশ করলেন তাঁর নিজ নাম।"[২০]

অর্থাৎ হাড়িরামের তত্ত্ব অনুযায়ী তিনি হলেন আদি পুরুষ, সবকিছুর স্রষ্টা। মালোপাড়ার শৈলেন হালদার জানিয়েছেন, মানব দেহ চার বীজে গঠিত। এই চার বীজ হল - হাড়, হাড্ডি, মনি (শুক্র) এবং মগজ। দীনুর একটি গানে পাওয়া যায় হাড়িরামী তত্ত্বের কথা। তিনি লিখেছেন -

"কারিগরের কী খোদাগিরি
গড়াচ্ছেন ঘর বরাবরি
ঘরের গড়নদারের বলিহারি
কিবা কারিকুরি চারিধার।।
ঘরের ফেলে জোবাকাঠি
চার চিজের চার খুঁটি
গড়লেন পরিপাটি
কী চমৎকার।।
ভেবে দিনু বলে, আমি
না চিনিলাম ঘরামি
ত্রিজগতের স্বামী রাম গড়নদার।।"[২১]

হাড়িরামকে শিষ্যরা মাতা-পিতা এবং জগতপতি বলে মান্য করেন। তারা বিশ্বাস করে যে, মাতার চার বীজ, বাবার চার এবং হাড়িরামের দশ বীজ নিয়ে মানব দেহ গঠিত। মানদেহে মাতৃবস্তু হল - ত্বক, মাংস, রক্ত, কেশ এবং পিতৃবস্তু হল - অস্থি, মজ্জা, শুক্র ও স্নায়ু। মাতৃবস্তু, পিতৃবস্তু এবং জগতপতির দেওয়া দশ উপাদান মিলে হয় আঠারো মোকাম। আর এই আঠারো মোকাম জুড়ে যার অধিষ্ঠান তিনি হলেন হাড়িরাম। আবার হাড়িরামের আর একটি গানে আছে -

"কারিগরের করা দিব্য মলিন করা,
দেহের ভিতর আছে ৩৬০ খান তারে জো।।
কারিগরের দেখো এমনি গো করা মাফে চৌদ্দ পোয়া,
আছে ৫২ বাজার, ৫৩ গলি, কয়জন দেয় পাহারা।।
দেহের ভিতর ছয় জন রিপু গো তার
কয়জন ঘুমায় মন, কয়জন জাগে গো তারা।।"[২২]

বলরামীরা বৈষ্ণবদের মত পরকিয়ায় বা গুরুবাদে বিশ্বাস করেনা। বৈষ্ণব বলতে সহজিয়া বৈষ্ণব এবং চৈতন্য সম্প্রদায়ের নানা অধঃপতিত শাখাকে বোঝানো হয়ে থাকে। এমন কি হাড়িরামের শিষ্যরা গৌরাঙ্গকে নিচু করে আত্মতুষ্টি লাভ করে থাকেন। এর কারণ হিসেবে অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন, - "...উনিশ শতকের গোড়ায় গ্রামসমাজে ব্রাহ্মণের চেয়ে লৌকিক বৈষ্ণবরা ছিলেন তাঁদের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁদের অবাধ সংখ্যা গরিষ্ঠতা সাধারণ দুর্বল ভক্তিমোহিত মানুষকে তীব্রভাবে টেনে নিচ্ছিলেন তাঁদের ধর্ম। সে প্রবল তরঙ্গ রোধ করার মত ক্ষমতা সংখ্যালঘু ও অচ্ছুত হাড়িরামের ধর্মমতের ছিল না। তাই তারা বিরুদ্ধাচরণ করতে তাঁর লিখেছিলেন বেশ কিছু ব্যঙ্গাত্মক ছড়া। সহজিয়া বৈষ্ণবদের অপ্রতিহত জয়যাত্রাকে ঠেকাতে তারা গৌরাঙ্গ পূজকদের প্রতিরোধ তৈরি করেন নতুন নতুন শ্লোক। যেমন -

"নিত্যচৈতন্য পুরুষ হাড়িরাম উদয় মেহেরপুর।
জানতে পারে তারই নিকট নইলে বহুদূর।।
বৈষ্ণবের জন্য কাঁদে নিতাই আর গৌর।
আবার ঐ বৈষ্ণব গোঁসাই ঠাকুরের ঠাকুর।।"[২৩]

সদাচারী জীবনযাপন, পরকীয়া বর্জন এবং গুরুবাদহীনতা তাদের এই ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তারা সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে না। দৈনন্দিন জীবনে তারা যে মন্ত্র পাঠ করে তা পুরোপুরি বাংলা ভাষায়। তার একটি উদাহরণ হল, বাইরে যাওয়ার সময় তারা যে মন্ত্রপাঠ করে তা হল -

"বলরাম চন্দ্র হাড়ি গোঁসাই
হাড় হাড্ডি মনি মগজ
তারক ব্রহ্ম রামনারায়ণ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 73
Website: https://tirj.org.in, Page No. 652 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জগৎ পতি পিতা
হায়াত-মউতের কর্তা
তুমি আমার রক্ষাকর্তা।"[২৪]

প্রথাগত ধর্মের আচার অনুষ্ঠান বা রীতিনীতি বলরামিদের মধ্যে নেই। এদের কোন ধর্ম গ্রন্থ নেই। তাঁর মূর্তি পূজা করে না। এরা প্রতিদিন বলরামের উদ্দশ্যে যে নৈবেদ্য দেয় তাতে থাকে, চাল, ডাল, গুড়, এবং নাড়ু। হাড়িরা দ্বীপ, ধূপ, তুলসী, তিলক, গঙ্গাজলের প্রভৃতি প্রচলিত মানে না। বলরামী শিষ্য ফণী বিশ্বাস জানিয়েছেন, -

> "হিন্দুদের মত গঙ্গার পবিত্রতা মানি না। পূণ্য মনে করে স্নান করি না। গঙ্গাজল আমরা হাড়িরামের সেবা পূজা স্নানেও দেই না। ...আমাদের কাছে গঙ্গা স্নান আর পাঁচটা প্রাকৃতিক জিনিসের মত।"[২৫]

বলরামীরা পায়ে হাত দিয়ে কাউকে প্রণামও করে না। এর উত্তর রয়েছে শ্লোকে -

"দেহ আমার শ্মশানের সমান
গুরু এসে মন্ত্র দিল
করলে ফুলের বাগান।"[২৬]

তাদের বিশ্বাস ভক্তহীনদের দেহ শ্মশান এর সমান। তাই তাদের পায়ে হাত দিলে হাড়িরামীদের তেজ সহ্য নাও করতে পারে। তাই তারা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে না।

বলরামীদের সব আশ্রম বা আখড়া বেলতলাতেই হয়ে থাকে। তারা বেলকে 'শ্রীফল' বলে। বেল হল আদ্যাশক্তির স্তনের প্রতীক আর বেলতলায় থাকা মানে আদ্যাশক্তির স্নেহ ছায়ায় থাকা। হাড়িরামের মতে জাতি দুটি - পুরুষ আর নারী। তাই বেলগাছকে জড়িয়ে দেওয়া হয় একটি ধুতি আর একটি শাড়ি। এদের সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ গোপনীয়তা ঘেরা নয়, এমন নয় যে এদের ক্রিয়াকর্ম মূলত সমাজ জীবনের বাইরে সাধন করা যাবে। বরং এদের সাধনার ধরণটি হল দৈনন্দিন সমাজ জীবনে দেহকে সংযত করা। এখানেও দেহ একটি সামগ্রী, যা তাঁর মালিক, দক্ষতা ও বিচক্ষণতা সঙ্গে কাজে লাগাতে পারেন অথবা লাম্পট্যের মাধ্যমে অপব্যয় বা ধ্বংস করতে পারে।

বলরামিদের সাধনার চারটি স্তর দেখা যায় - 'খাসতন', 'নিত্যন', 'এয়োতন' এবং 'বোধিতন'। এই চারটি স্তরের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সুধীর চক্রবর্তীর লেখায়। তিনি লিখেছেন হাড়িরামিদের ধর্মসাধনার সবচেয়ে উঁচু স্থান খাসতনের। পৃথিবীর আলো, হাওয়া, আকাশ, আগুন, জল সবকিছুই ঈশ্বরের খাসতালুকের প্রজা। এরা কাউকে খাজনা দেয়না। অর্থাৎ এদের অস্তিত্বের বিনিময়ে কোন রকম মূল্য দিতে হয় না। হাড়িরাম এঁদের কাছে ছিলেন খাসতনের সাধক। খাসতনের একেবারে উল্টো ধর্ম বোধিতন। যেখানে অজ্ঞানতা ও অসহয়াতার জন্য কেবল মূল্য দিতে হয় অকারণ বিন্দুপাতে, অতিপ্রয়োনীতায় ও বন্ধনে। হাড়িরামের ধর্ম, গৃহী ধর্ম কিন্তু যে গৃহী অন্ধভাবে রোজ দেহ সঙ্গম করে এবং অকারণ বীর্য ক্ষয় করে সেই বদ্ধ হয় বোধিতনে। এই সম্প্রদায়ে তাই বোধিতনের বন্ধন থেকে সব ভক্ত মুক্তির আকুল প্রার্থনা করে। এই বন্ধন থেকে মুক্তি স্তরই হল এয়োতন। গৃহী হাড়িরামি যে- ধর্ম পালন করেন তাকে বলে এয়োতন। এটি আসলে এক রকম জন্ম নিয়ন্ত্রণের কৌশল। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে জানে না। তাই 'এয়োতন' ধর্মে বলা হয়েছে দেহ- সঙ্গম করতে হবে কেবল সন্তান কামনায়। বৃথা সঙ্গম ও অকারণ বীর্যক্ষয় মহাপাপ। হাড়িরামের অনুগামীরা বিশ্বাস করে -

"সন্ধ্যাবেলা সঙ্গম করলে সন্তান হয় চোর বা গুন্ডা।
রাত বারোটার আগে সঙ্গম করলে সন্তান হয় ডাকাত
বা দস্যু। রাত বারোটা থেকে ভোরের মধ্যে সঙ্গম
থেকে জন্ম নেয় সর্বলক্ষণযুক্ত দেবাগুণানবতি।"[২৭]

এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় হাড়িরামি সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিকনেতা বা 'সরকার' চারুপদ মণ্ডলের কাছে, -

> "হাড়িরাম ঐ নির্দেশ আসলে গরীব মূখ্য গাঁয়ের মানুষদের সাবধান করা বই আর কি? গ্রামদেশে জানেন তো, সন্ধ্যারাতেই নেমে আসে রাত্তির। মেয়ে পুরুষ তখন কি করবে? শুয়ে পড়ে। জানেন তো গ্রামে

> একটা কথা খুব চলিত আছে যে 'কাজের মধ্যে দুই খাই আর শুই'। এখানে শোওয়া মানেই দেহের মিলন। আপনাদের শহুরে জীবন আসছে নানা রঙ্গরস সিনেমা সার্কাস খাওয়া-দাওয়া হোটেল রেস্টুরেন্ট। গ্রামে ও সব কই? সারাদিন মাঠে, খামারে ভুতের মত খাতে, গরীব মানুষ সব, ঘরে বেশিক্ষণ লণ্ঠন জ্বালাবার কেরোসিন পর্যন্ত থাকে না। তাছাড়া নানা দলাদলি। কী দারকার? যে যার মত শুয়ে পড়ে। কিন্তু রাত তো লম্বা। পাশাপাশি স্বামী-স্ত্রী। দেহধর্ম একটা আছে তো? তাই কেবলি সঙ্গম আর বীর্যক্ষয়। তার থেকে অনবরত সন্তান জন্ম। হাড়িরামের সময় তো জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ওঠেনি। উনি তাই কৌশলে একটা আইন চাপিয়ে গেছেন। বুদ্ধিমান বাচক মানুষ ছিলেন তো! কে আর চায় বলুন যে তার সন্তান হোক চোর ডাকাত।"[২৮]

এয়োতন সাধক যখন সফলতা পাবেন অর্থাৎ অভিপ্রেত সন্তান লাভ ঘটবে একটি বা দুটি, তখন তাঁর সাধন মার্গ হবে নিত্যন। চিরতরে দেহের আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে নিত্যপুরুষ হাড়িরামের ধ্যান জ্ঞানে মগ্ন থাকা নির্জন বনে বা নদীর তীরে বা বেলতলায়, এই হল নিত্যনের লক্ষণ। এই নত্যিন লাভই হল মুক্তি। এইভাবে হাড়িরাম শিখিয়েছেন কিভাবে সংসারের মধ্যে থেকে সাধনার মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা যায়। একটি শাখার ভক্তরা বলরামের মৃত্যুর পর একটি ছোট ঘর তৈরি করে রেখেছেন এবং সন্ধ্যায় প্রদীপ দেয় ও প্রণাম করে। আর অন্য শাখার ভক্তরা বলরামের এইরকম আজ্ঞা নেই বলে তাঁরা কোনরূপ অনুষ্ঠান করে না। অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী তাঁর অনুসন্ধানে এই বিভাজনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্ধেহ প্রকাশ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে বলরামও এই ধরণের কোন বিধান দেননি। তিনি ছিলেন ব্রাত্যজনের পথপ্রদর্শক। তাঁর সংস্পর্শে এসেই মুক্তি পেয়েছেন অসংখ্য দরিদ্র, অস্পৃশ্য, সর্বহারা শ্রেণির মানুষ।

অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী যখন অনুসন্ধান করেন এই সম্প্রদায় এর অস্তিত্বের সঙ্কট লক্ষ্য করেছেন। তিনি হাড়িরামের শিষ্যদের যে তালিকা দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে এখন আর কেউ জীবিত নেই। আর নতুন প্রজন্মের কেউ হাড়ি সম্প্রদায়ে ভূক্ত হওয়ার প্রবণতা নেই। নিশ্চিন্তপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বলাহাড়ি সম্প্রদায় এর একটি পরিবারও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এখন প্রশ্ন হল এই রকম একটি সম্প্রদায় যেখানে নিম্নবর্ণের মানুষ মাথা উঁচু করে ধর্মাচারণের অধিকার লাভ করেছিল তারা আজ কেন বিলুপ্ত? নিশ্চিন্তপুরে টিকে আছে শুধু হাড়িরামের খড়ম, মৃত বেলগাছ আর নতুন আশ্রম, সেখানে হাড়িরামের কোন শিষ্য এর দেখা মেলে না। এর কারণ হিসেবে বলা যায় স্বাধীনোত্তর ভারতে ব্যাপক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন।

দেশবিভাগ হাড়ি সম্প্রদায়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। দেশভাগের ফলে হাড়িদের প্রধান কেন্দ্র নিশ্চিন্তপুর চলে যায় পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে আর দ্বিতীয় প্রধান কেন্দ্র থাকে ভারতের মধ্যে। স্বাভাবিকভাবে এই বিভাজনের ফলে নিশ্চিন্তপুরের হাড়ি সম্প্রদায় অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এছাড়া পরিসংখ্যানে দেখা যায় ধারাবাহিক ভাবে এই জেলায় হাড়িদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। একটি তালিকা দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক -

সাল	হাড়িদের সংখ্যা
১৮৭২	৪,১১৩ জন
১৮৮১	৬,৪১৫ জন
১৮৯১	....
১৯০১	৫,০৬৯ জন
১৯১১	৪,০৩৫ জন
১৯২১	৩,৭২৯ জন
১৯৩১	৩,২৮০ জন
১৯৪১	২,২৬০ জন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 73
Website: https://tirj.org.in, Page No. 652 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৯৫১	১,৮৪৯ জন

(Mitra, A, The Tribes and Castes of West Bengal, West Bengal Press, Alipur, 1953, p-101)

অষ্টাদশ শতকে ভারতে জাতি, রাষ্ট্রের ধারণা স্পষ্ট ছিল না। সমাজ নানা জাতি উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। সেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভোগ করতেন সমাজে কিছু উচ্চ শ্রেণির প্রভাবশালী ব্যক্তি। নিচুতলার মানুষের কোন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। এই পরিস্থিতিতে বলরাম নিচু শ্রেণির মানুষকে বাঁচার পথ দেখিয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসন কালে ভারতে জাতি রাষ্ট্রের ধরণা সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে এবং সমাজে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা কমে আসে। স্বাধীন ভারতীয় সংবিধানে ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ফলে সমাজে সকলের সমান অধিকারের কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনি স্বাধীনভাবে যে কোন ধর্ম পালনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। আর এই কারণে সমাজের গৌণধর্মগুলি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে আর প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীতা কমে এসেছিল।

যে কোনো ধর্ম প্রসারের জন্য প্রয়োজন হয় শাসক শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতা এবং প্রচার। বলাহাড়ি সম্প্রদায়ে কোন উচ্চ শ্রেনির মানুষ নেই। কোনো প্রভাবশালী বা শাসক এই ধর্ম গ্রহণ বা সমর্থন করেনি। বরং সমাজের উচ্চশ্রেণি, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল বিরোধিতা করেছেন।

> “Aristocratic Brahmanism can only punish them by keeping them excluded from the pale of humanity.”[২৯]

এই প্রবল বিরোধিতা বলাহাড়িদের পক্ষে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। এছাড়া নিশ্চিন্তপুরের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন চোখে পরার মত। কৃষির ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হয়েছে। সে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে চায়। কিন্তু বলাহাড়ি সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় সমাজের উচ্চশ্রেণির কাছে সে অবহেলিতও। তাই নতুন প্রজন্ম বলরামকে ভক্তি করলে এই ধর্ম আর নতুন করে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক না। আর হাড়িরামের কোন সন্তান ছিল না। তাই বংশ পরম্পরায় এই মত ধরে রাখার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কর্তাভজা বা সাহেবধনী সম্প্রদায় আজও টিকে থাকার একটি কারণ হল তাদের বংশের উত্তরাধিকারীদের উপস্থিতি। এই উত্তরাধিকারদের কেন্দ্র করে মানুষ আজও মানুষ সমবেত হয়। বর্তমানে বলরাম তাই টিকে আছেন নিশ্চিন্তপুরের মানুষের মনে। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস হাড়িরাম এখনও তাদের রক্ষা করছেন। তাঁর মহিমা লোকমুখে প্রচলিত। আর হাড়িরাম এই ভাবেই সকলের মধ্যে বেঁচে আছেন এবং থাকবেন।

Reference:

১. দত্ত, অক্ষয়কুমার, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), বিনয় ঘোষ (সম্পা), পাঠভবন, কলকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩৭
২. বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত), বিশ্বকোষ(দ্বাদশ খণ্ড), বি আর পাবলিশিং কর্পোরেশন, দিল্লী, ১৯৮৮, পৃ. ৬২২
৩. দত্ত, অক্ষয়কুমার, বিনয় ঘোষ (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭
৪. চক্রবর্তী, সুধীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৫. ভট্টাচার্য, যোগেন্দ্রনাথ, হিন্দু কাস্ট অ্যান্ড সেক্টস, থ্যাকার স্পিঙ্ক অ্যান্ড কোঃ, কলকাতা, ১৮৯৬, পৃ. ৪৯৩
৬. চক্রবর্তী, সুধীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৭. দত্ত, অক্ষয়কুমার, বিনয় ঘোষ (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭
৮. রায়, দীনেন্দ্রকুমার, সেকালের স্মৃতি, নাভানা, কলকাতা, ১৯৫৩, পৃ. ২২
৯. তদেব, পৃ. পৃ. ২৩-২৪
১০. ভট্টাচার্য, যোগেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৩
১১. তদেব, পৃ. ৪৯৩
১২. খান, মো. আলতাফ হোসেন, শামসুজ্জামান, আমিনুর রহমান সুলতান, (সম্পাদনায়), বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা মেহেরপুর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৩৫
১৩. চক্রবর্তী, সুধীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 73
Website: https://tirj.org.in, Page No. 652 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৪. চক্রবর্তী, সুধীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

১৫. চক্রবর্তী, সুধীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

১৬. তদেব, পৃ. ৬১

১৭. তদেব, পৃ. ৬৯

১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর ও দাশগুপ্ত, অভিজিৎ (সম্পাদনা), জাতি, বর্ণ ও সমাজ, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিস, দিল্লি, ১৯৯৮, পৃ. পৃ. ৮৮-৮৯

১৯. চক্রবর্তী, সুধীর, বাংলার গৌণধর্ম সাহেবধনী ও বলাহাড়ি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১০১

২০. খান, শামসুজ্জামান ও হোসেন মো. আলতাফ (সম্পাদনায়), বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা মেহেরপুর, আমিনুর রহমান সুলতান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৬৫।

২১. তদেব, পৃ. ২৩৫

২২. আয়ম, তোজাম্মেল, মেহেরপুর জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য, গতিধারা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৫৯

২৩. খান, শামসুজ্জামান ও হোসেন, মো. আলতাফ (সম্পাদনায়), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

২৪. চক্রবর্তী, সুধীর, বাংলার গৌণধর্ম সাহেবধনী ও বলাহাড়ি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. পৃ. ১০৩-০৪

২৫. তদেব, পৃ. ১৪৬

২৬. সরকার, সোমব্রোত, কর্তাভজা, দেহবাদ, লোকতন্ত্র, অণেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ২৮৪

২৭. চক্রবর্তী, সুধীর, বাংলার গৌণধর্ম সাহেবধনী ও বলাহাড়ি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১২৮

২৮. তদেব, পৃ. ১০১

২৯. ভট্টাচার্য, যোগেন্দ্রনাথ, হিন্দু কাস্ট অ্যান্ড সেক্টস, স্পিঙ্ক অ্যান্ড কোঃ, কলকাতা, ১৮৯৬, পৃ. ৪৮৩